প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬০

প্রকাশক : অমল গুপ্ত অয়ন ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর : রবীন্দ্রনাথ দাশ মুদ্রাকর প্রেস
১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন কলকাতা ৭০০ ০০৩

চিত্রশিল্পী : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

কে এই মোল্লা নসিরুদ্দীন ? বা নসিরুদ্দীন খোজা ? বা নসিরুদ্দীন অবন্তী ?

গোপাল ভাঁড়কে চেনো ? বীরবলকে চেনো ? তাহলে নসিরুদ্দীনকেও চেনো। এঁর দেশ ছিল মধ্যপ্রাচ্যেরই কোথাও, হয়তো তুর্কিতে। কবেকার লোক ? তা গত সাত শ বছর ইনি বহাল তবিয়তে আছেন। এককালে খোঁড়া তৈমুর বাদশার সঙ্গে শিকারে বেরোতেন, এখন উড়োজাহাজ চড়ছেন।

গোপাল ভাঁড় বা বীরবলের নামে যত গল্প চালু আছে, সব তো আর তাঁদের জীবনে ঘটে নি। এর-ওর-তার গল্প একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে এক-একটা কথাসরিৎসাগর তৈরি হয়েছে। নসিরুদ্দীন এ বাবদে সবার থেকে এক ধাপ এগিয়ে আছেন। কোনো বাঁধা দেশ-কালের চৌহদ্দিতে তাঁকে আটকে রাখা যায় নি। গ্রীকরাও তুর্কিদের কাছ থেকে নিয়ে নসিরুদ্দীনকে তাদের লোকযানের ('ফোক-লোর') অংশ করে নিয়েছে। মধ্যযুগে বড়ো কত্তাদের নিয়ে মস্করা করার জন্যে নসিরুদ্দীনের গল্প চালু ছিল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে তাঁকে 'জনগণের বীর' খাড়া করে ছবি (ফিল্ম) তোলা হয়েছে। চীনের জনসাধারণতন্ত্রে তাঁর গল্প জড়ো করে বই বেরিয়েছে — চীনে-ইংরিজি দু ভাষায়। জর্মন

বিশ্বকোষেও তাঁর নাম পাবে (বৃটিশ বা মার্কিন বিশ্বকোষে নেই)। বল্কান ও সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার সব জায়গায় মোল্লার দারুণ খাতির।

মোল্লাকে নিয়ে সবচেয়ে নাচানাচি করে অবশ্য তুর্কি। তাঁর জন্মস্থানের দাবিদার তুর্কির আক্‌শিহার। মোল্লার বিখ্যাত গোরস্তান নাকি এখনো সেখানে আচে। প্রতি বছর বিরাট করে নসিরুদ্দীন মোচ্ছব হয়। নসিরুদ্দীন সেজে তাঁর বিখ্যাত রসিকতাগুলো অভিনয় করে ছাখানো হয়।

বীরবল বা গোপাল ভাঁড়ের সঙ্গে নসিরুদ্দীনের অবশ্য একটা বড়ো তফাৎও আচে। আর সেটাই মোল্লার বিশেষত্ব। কোনো কোনো গল্পে তিনি ভীষণ চালাক, বাঘা বাঘা লোককে ঘোল খাইয়ে ছাড়েন। কোথাও বা তিনি ডাহা মুখ্যু—কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ। মোল্লা যে আসলে কী—সেটা কেউই ঠিক ঠাহর করতে পারে না।

সুফি দার্শনিকরা তাঁদের তত্ত্বশিক্ষায় মোল্লার গল্প ব্যবহার করেন। লোককে বলা হয়, পছন্দমতো একটা গল্প বেছে নাও, তারপর গভীরভাবে তার তাৎপর্য চিন্তা করো। জ্ঞান আসে ধ্যান থেকে। সায়েব পণ্ডিতরা অবশ্য এতে আপত্তি করেন, কিন্তু বেরুট-করাচির বিশেষজ্ঞদের মতে, নসিরুদ্দীন ছিলেন সত্যিসত্যিই সুফি গুরু।

গত হাজার কয়েক বছরে মানুষ অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়েচে, পায়নি আরো বেশি প্রশ্নের। তারই একটা হলো : আমরা হাসি কেন ? সবার মন মতো কোনো জবাব আজ অবধি কেউ দিতে পারে নি। মোল্লার গল্প শুনে হাসি পায় কেন—এর কোনো পাকা জবাবও দেওয়া যাবে না।

তবে একটা কথা বলতে পারি। নসিরুদ্দীন-তৈমুর, বীরবল-আকবর, গোপল-কৃষ্ণচন্দ্র—এই জুড়ির মধ্যে একটা ব্যাপার আচে। নসিরুদ্দীন-

বীরবল-গোপাল—এঁরা সবাই খুব সাধারণ লোক। চালচুলো নেই, পয়সা-কড়ি নেই, খানদানি বংশেও কেউ জন্মান নি। রাজা-বাদশার দয়া কুড়িয়েই বাঁচতে হয়। কিন্তু এক জায়গায় এঁদের জিৎ। রাজা-বাদশার মুখের ওপর হাজির জবাব দিতে, তাঁদের মুখ একেবারে 'দিস কাইণ্ড অব স্মল' করে দিতে এঁদের জুড়ি নেই। এক দিক দিয়ে দেখলে, সাধারণ মানুষ (অবস্থার ফেরে যাদের মাথা নিচু করে দিন কাটাতে হয়) রাজারাজড়াদের ওপর শোধ তুলেচে এই গল্পগুলো দিয়ে। রাজার আচে লোক লস্কর হীরে জহরৎ ঢাল তলোয়ার। সাধারণ মানুষের সম্বলের মধ্যে সেরেফ বুদ্ধি।

আর এটাই তো সবচেয়ে বড়ো কথা। রাজার যা আচে—সে তো টাকার জোরে, গায়ের জোরে। তাতে কী এসে যায় যদি না-থাকে আসল জোর—বুদ্ধির জোর? বীরবল-গোপাল-নসিরুদ্দীনের অনেক গল্পে এই কথাটাই একটু চাপা গলায় বলা থাকে।

যদ্দিন পৃথিবীতে বহুরূপী রাজারাজড়ার গাজোয়ারি থাকবে, এসব গল্প পুরনো হবে না।

এই ভরসাতেই মোল্লার গল্পের ভাঁড়ার থেকে বাছাই করে কিছু সরেস জিনিস তুলে দিচ্চি।

মোল্লার গল্প নিয়ে প্রথম ইংরিজি বই বেরিয়েছিল সোসাইটি ফর প্রমোটিং খ্রীশ্চান নলেজ-এর উদ্যোগে (ভাবা যায়?)—শ্রীমতী এয়িং (Ewing)-এর 'খোজার গল্প' (*Tales of the Khcja*, 1896)।

হালে মোল্লার অনেক গল্প জড়ো করে তিনটি বই বার করেচেন সুফি বিশেষজ্ঞ ইদ্রিশ শাহ্। বইগুলোর সর্বস্বত্বের মালিক মোল্লা নসিরুদ্দীন এণ্টারপ্রাইজেস লিমিটেড! এ বইএর অনেক গল্পই ইদ্রিশ শাহ্-র সংগ্রহ থেকে।

অনরবল হুতোম-এর স্মরণে

মোল্লা আর আমি

যাঁর ভাষায় কথা কই

এক

নসিরুদ্দীনের এক পড়শি এসে বললো :

'মোল্লা, তোমার গাধাটা একদিনের জন্মে একটু ধার দেবে ?'

'না ভাই, সে কী করে হবে, আমি তো ওটা অ্যার‍্যাকজনকে দিয়েচি।'

নসিরুদ্দীনের কথা শেষ হতে-না-হতে গাধাটা ডেকে উঠলো।

পডশি মুচকি হেসে বললো :

'মোল্লা, তোমার গাধাটা কিন্তু অন্য কথা বলছে।'

মোল্লাও গম্ভীর হয়ে বললেন :

'ছিঃ। শেষ অবধি গাধার কথা বিশ্বাস করলে

দুই

হাটবারে মোল্লা দাঁড়িয়ে থাকতেন রাস্তায়। কেউ হয়তো একটা টাকা কি আধুলি দিতে এলো, সেটা তিনি নেবেন না। কিন্তু দু পয়সা কি এক পয়সা দাও—নেবেন। লোকেও তাঁকে ডাহা মুখ্যু ঠাউরে বেশ মজা পেতো।

একদিন একটি লোক বললো :

'মোল্লা, তোমার তো বেশি পয়সাই নেয়ার কথা। তাতে তোমারও আয় বাড়ে, লোকেও আর ঠাট্টা করে না।'

'তা হতে পারে। কিন্তু আমি যদি রোজ বেশি পয়সা নিই তো লোকে আর বোকামি ছ্যাখার জন্যে পয়সাই দেবে না। তার চেয়ে এই বেশ।'

তিন

এক ফোঁটা বিষ্টি নেই। পুকুরের জল তলায় গিয়ে ঠেকেচে।

কে বিষ্টি আনতে পারে ?

মোল্লা একটা টবে খানিক সাবান-জল আনার ফরমাশ করলেন। গায়ের জামাটা তাতে চুবিয়ে আড়চোখে আকাশের দিকে তাকালেন। এইভাবে, খানিকক্ষণ বাদে বাদেই, তাঁর জামা কাচা ও আকাশ ছ্যাখা চললো। একজন আর থাকতে না পেরে বলে উঠলো :

'তোমার জামা কাচার সঙ্গে বিষ্টির কী সম্পর্ক ?'

'ধৈর্য ধরো বাবা', মোল্লা বললেন, 'সম্পর্কটা কাচার সঙ্গে নয়, শুকুর দেওয়ার সঙ্গে। সব্বাই জানে, যেই জামাটি শুকুর দেবে অমনি বিষ্টি আসবে।'

চার

নসিরুদ্দীনের গাঁয়ে ছুই যমজ ভাই ছিল। একদিন মোল্লা শুনলেন, তাদের এক ভাই মারা গ্যাচে।
রাস্তায় তাদের একজনকে দেখতে পেয়ে মোল্লা দৌড়ে গিয়ে জিগেস করলেন :
'তোমাদের মধ্যে কে যেন মারা গ্যাচে ?'

পাঁচ

মোল্লার গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকই নিরক্ষর। মোল্লাই তার মধ্যে খানিক লেখাপড়া জানেন।
একবার একটি লোক এলো মোল্লাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে। সে যা বলে গেলো, মোল্লাও লিখে গেলেন।
'এবার চিঠিটা গোড়া থেকে পড়ুন তো। কিছু বাদ গেলো কিনা দেখি', লোকটি বললো।
মোল্লা চোখমুখ কুঁচকে নিজের লেখার দিকে তাকালেন।
' 'প্রিয় ভ্রাতঃ', এর বেশি আর কিছু তো পড়া যাচ্চে না।'
'সে কি ! নিজের লেখা যদি নিজেই পড়তে না পারেন তো কে পড়বে ?'
'সেটা আমার ভ্যাথার কথা নয়', মোল্লা গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমার কাজ লেখা, পড়া না।'
'তা তো বটেই।' লোকটাও ঘাড় নেড়ে বললো, 'তা ছাড়া চিঠিটা আপনাকে লেখা হয় নি। পরের চিঠি পড়া একেবারে উচিত না।'

ছয়

'আল্লার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

কী এক ব্যাপারে এক ভক্ত বললেন।

'সর্বদাই সেটা হয়', ব্যাজার মুখে বললেন নসিরুদ্দীন।

'কী করে সেটা প্রমাণ হবে?'

'সিধে ব্যাপার। তা যদি না হতো তবে একবার-না-একবার তো আমার ইচ্ছেও পূর্ণ হতো।'

সাত

নসিরুদ্দীন জমিয়ে গপ্প বলচেন :

'বাদশার কাছে একদিন তো একটা ঘোড়া এনেচে। কেউ তাকে বাগ মানাতে পারে না। ভীষণ তেজি। আমার কেমন রোখ চেপে গেলো। তাল ঠুকে বললুম, 'কী কারুর খ্যামতায় কুলোচ্চে না? দাও আমাকে। দেখিয়ে দি, কী করে বেয়াড়া ঘোড়া শায়েস্তা করতে হয়।'

লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলুম ঘোড়াটার দিকে।'

সবাই ঘাড় উঁচিয়ে বললো : 'তারপর?'

'আমিও পারলুম না', শান্ত ভাবে বললেন মোল্লা।

আট

নসিরুদ্দীন তাঁর বাড়ির চারধারে রুটির টুকরো ছড়াচ্চেন।

'কী করছ মোল্লা?' একজন কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলো।

'যাতে বাঘ না আসে তার ব্যবস্থা করচি।'

'কিন্তু এ গাঁয়ে তো বাঘ নেই। কখনো আসে বলেও শুনি নি।'

'তবেই বোঝো। কেমন কাজ দিচ্চে।'

এক দার্শনিক, তর্ক করার জন্যে, নসরুদ্দীনের সঙ্গে আগে থাকতে দিনক্ষণ ঠিক করে রেখেছিলেন। ঠিক সময়ে গিয়ে দ্যাখেন, মোল্লা বাড়ি নেই।

দার্শনিক তো খুব চটে গিয়ে নসরুদ্দীনের বাড়ির দরজায় বড়ো বড়ো করে 'গা ধা' লিখে ফিরে গেলেন।

ঘণ্টা পাঁচেক বাদে হেলতে দুলতে বাড়ি ফিরে মোল্লার সেটা নজরে পড়লো। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন দার্শনিকের বাড়ি।

'সত্যিই আমি দুঃখিত—ভীষণ দুঃখিত। একদম ভুলে গেসলুম। বাড়ির দরজায় আপনি নিজের নামটা লিখে গ্যাচেন দেখে মনে পড়লো—ইস্।'

দশ

নসিরুদ্দীন একটা দোকান খুলেচেন। ওপরে বড়ো বড়ো করে লেখা

যে কোনো বিষয়ে দুটি প্রশ্ন !
একশ টাকা দিলেই উত্তর !!

একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে টাকাটা দিয়ে বললো :
'দুটো প্রশ্নের জন্যে একশ টাকা একটু বেশি হয়ে যায় না ?'
'হ্যাঁ।' বললেন নসিরুদ্দীন, 'আপনার দ্বিতীয় ও শেষ প্রশ্নটা ?'

এগারো

চ্যালাচামুণ্ডাদের নিয়ে মোল্লা গ্যাচেন মেলায়। নানা দোকান ঘুরে সবাই এসে দাঁড়ালেন তীরন্দাজির দোকানে। লক্ষ্য ভেদ করতে পারলে বেশ ভালো ইনামের (পুরস্কার) ব্যবস্থা আচে।
মোল্লা গম্ভীরভাবে ধনুক আর তিনটে তীর তুলে নিলেন। তাঁর তীরন্দাজি দেখতে মেলার লোক ভেঙে পড়লো।
'ভালো করে লক্ষ করুন সবাই', তীরন্দাজ সৈনিকের মতো টুপিটা পেছন দিকে হেলিয়ে মোল্লা বললেন।
প্রথম তীরটা লক্ষ্যের ধারে-কাছেও গেলো না।
লোকজন টিটকিরি দিয়ে উঠলো। চেলারাও অপ্রস্তুত। মোল্লা হেঁকে বললেন : 'চোপ্। এ তো শুধু দ্যাখালুম, সৈন্যরা কী করে তীর ছোঁড়ে। ঐ জন্যেই তো আমরা যুদ্ধে হারি।'
মোল্লা এবার দ্বিতীয় তীরটা ছিলায় লাগিয়ে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিলেন।

ধনুষ্টঙ্কারই সার। লক্ষ্যে পৌঁছনোর অনেক আগেই তীরটা মাটিতে শুয়ে পড়লো।

'দ্যাখো, হড়বড় করে তীর ছুঁড়লে এ-ই হয়। প্রথম বার পারে নি, দ্বিতীয় বার মন দিয়ে ছোঁড়ার মতো তাকৎ-ও নেই।'

সবাই, মায় দোকানের মালিকও, এ র'ম ব্যাখ্যা শুনে মোহিত।

এবার মোল্লা ডোণ্ট কেআর ভাব করে ধনুকে শেষ তীরটা লাগালেন। লক্ষ্যে গেঁথে তীরটা থরথর করে কাঁপতে থাকলো।

কোনো কথা না বলে মোল্লা পছন্দসই ইনাম বেছে নিলেন। তারপর এগিয়ে চললেন অন্য দোকানের দিকে।

লোকজন হৈ হৈ করে উঠলো।

'চোপ্!' মোল্লা আবার হাঁক ছাড়লেন, 'কী বলতে চাও একজন বলো।'

এক মুহূর্ত সব চুপ। শেষে একজন এগিয়ে এসে বললো :

'আমরা, মানে, জানতে চাইছি, শেষ লোকটি কে।'

'ঐ লোকটা? ও, সে তো আমিই।'

বারো

মোল্লা গ্যাচেন ফুটবল খেলা দেখতে। হাফ-টাইম অবধি বিস্তর চেল্লা-চেল্লি করে ভীষণ তেষ্টা পেলো। ভিড় ঠেলে চললেন 'পানীয় জল'-এর দিকে।

'আমার জন্যেও একটু এনো', তাঁর বন্ধু হেঁকে বললেন।

কিছুক্ষণ বাদে দাড়ি মুছতে মুছতে ফিরে এলেন মোল্লা—খালি হাতে।

'কী হলো? আমার জল?'

'চেষ্টা করেছিলুম ভাই। কিন্তু নিজে এক ঢোক খেয়েই বুঝলুম, সত্যি-সত্যি তোমার তেমন তেষ্টা পায় নি।'

তেরো

মোল্লা তাঁর বউকে বললেন হালুয়া করতে।

বউ তো বেশ এক গামলা হালুয়া করে মোল্লাকে দিলেন। তার প্রায় সবটাই মোল্লার পেটে গেলো।

মাঝরাতে বউকে ঘুম থেকে তুলে মোল্লা বললেন :

'একটা ব্যাপার মাথায় এয়েচে।'

'কী ?'

'বাকি হালুয়াটা নিয়ে এসো, বলচি।'

চেটেপুটে গামলা সাফ করে মোল্লা আবার শুয়ে পড়লেন।

'এই, কী ভেবেছ বললে না তো ? না শুনলে আমার সারারাত ঘুম হবে না।'

'ভাবলুম বাকি হালুয়াটা না খেয়ে ঘুমোনো ঠিক হবে না।'

চোদ্দ

'তুমি যে সুফি যোগী তার প্রমাণ দিতে না পারলে এক্ষুনি কোতল করব', হুংকার ছাড়লেন শাহানশা।

'অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস আমি দেখতে পাই', মোল্লা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আকাশে সোনালি পাখি, পাতালে দৈত্যদানা।'

'মাটি ভেদ করে তোমার চোখ যায় কী করে ? অত উঁচুতে কী হচ্ছে তুমি দেখতে পাও ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু ভয় পাওয়া চাই। তাহলেই' —

পনেরো

খিদের চোটে নসিরুদ্দীনের পেট জ্বলচে। রেস্তোরাঁয় ঢুকে দু হাতে খেতে শুরু করলেন।

সবাই তো অবাক।

একজন আর থাকতে না পেরে বললো ঃ

'দু হাত দিয়ে খাচ্ছ কেন, মোল্লা ?'

হাত-মুখ না তুলে নসিরুদ্দীন বললেন

'তিনটে হাত নেই বলে।'

ষোলো

মোল্লা এক দোকানে গ্যাচেন। টুকিটাকি সব জিনিস সেখানে পাওয়া যায়।

'তোমার এখানে পেরেক আচে?'

'হ্যাঁ।'

'চামড়া? ভালো চামড়া?'

'হ্যাঁ।'

'সুতুলি?'

'হ্যাঁ।'

'রং?'

'হ্যাঁ।'

'তা'লে এক জোড়া জুতো বানাতে কী হয়?'

সতেরো

অনেক কষ্টে কিছু পয়সা জমিয়ে মোল্লা গেলেন দর্জির দোকানে একটা জামা তৈরি করাতে। দর্জি বেশ যত্ন করে মাপ-টাপ নিয়ে বললো:

'সামনের হপ্তায় আসুন। জামা তৈরি হয়ে যাবে, ইনশা আল্লা।'

উত্তেজনা চেপে রেখে মোল্লা পরের হপ্তায় গেলেন।

'একটু দেরি হবে। তবে পরশু নিশ্চয়ই হয়ে যাবে, ইনশা আল্লা।'

মোল্লা ঠিক সময়ে হাজির হলেন।

'আফসোস, খুব আফসোসের কথা। আর একটু বাকি আছে। কাল আসুন, হয়ে যাবে, ইনশা আল্লা।'

হতাশ হয়ে মোল্লা বললেন:

'আল্লাকে এর বাইরে রাখলে ক-দিন লাগবে?'

আঠেরো

বাদশা বুনো শুওর শিকারে বেরুবেন, সঙ্গে যাওয়ার জন্যে মোল্লার ডাক পড়লো। শুওর বহুৎ বিপজ্জনক জানোয়ার। নসিরুদ্দীনের একটুও ইচ্ছে ছিল না, তবু শেষ অবধি যেতেই হলো।

গাঁয়ে ফেরার পর লোকজন ছেঁকে ধরলো।

'শিকার কেমন হলো, মোল্লা?'

'চমৎকার!'

'তুমি ক-টা মারলে?'

'একটাও না।'

'ক-টাকে খেদালে?'

'একটাও না।'

'ক-টা দেখতে পেলে?'

'একটাও না।'

'তাহলে শিকারটা চমৎকার হলো কী করে?'

'যখন বুনো শুওর শিকার করচ, তখন 'একটাও না' মানে যথেষ্টরও বেশি।'

উনিশ

'মোল্লা, তোমার গাধাটা হারিয়ে গেছে।'

'আল্লা মেহেরবান! ভাগ্যিস আমি তখন ওর পিঠে ছিলুম না! তা'লে আমাকেও খুঁজে পেতে না!'

কুড়ি

অনেক কষ্টে নসিরুদ্দীন তো দরবারে ঢুকেচেন। বাদশারও নজর গেলো তাঁর দিকে।

'কী চাই তোমার?'

'এক লাখ মোহর।'

থমকে গিয়ে বাদশা বললেন :

'একটু কম নিলে হতো না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই···পাঁচ মোহর।'

'দুটোর মধ্যে বড্ড ফারাক হয়ে যাচ্ছে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আ প না র দাম এক লাখ মোহর, আ মা র পাঁচ।'

একুশ

খানাবাদের এক দোকানে বসে মোল্লা চা খাচ্চেন।

একটা লোক এসে চুপি চুপি জানতে চাইলো :

'ঐ লোকটা বসে বসে কাঁদছে কেন মশাই?'

'আমি ওর দেশ থেকে খবর এনেচি যে। শীতকালে উটের খাওয়ার জন্যে য্যা খাবার জমিয়ে রেখেছিল, সব আগুনে পুড়ে গ্যাচে।'

'তা বটে। এমন খবর দিতেও খারাপ লাগে', লোকটি বললো।

'কিন্তু এরপর যে একটা ভালো খবরও দোবো! ওর উটগুলোও মহামারি লেগে মরে গ্যাচে।'

বাইশ

মোল্লা গ্যাচেন গাঁয়ের এক রইস আদমির বাড়ি। ভদ্দরলোক তাঁর ঘোড়াগুলো এনে অতিথিদের ছ্যাখালেন। সহিস খুব বড়ো গলা করে হেঁকে চললো :

'এই ঘোড়ায় চড়েছিলেন রাজা অমুকচন্দ্র তমুক বাহাদুর, এইটায় খালিগাঁও-এর জমিদার···'

মোল্লাও কি কমতি যান ? তিনিও মেজাজের মাথায় হুকুম করলেন : 'আমার জন্যে এমন একটা ঘোড়া আনো যে ঘোড়ায় কেউ কখনো চড়ে নি।'

তেইশ

জাহাজে মোল্লাই একমাত্র যাত্রী। বেশ যাচ্চে, হঠাৎ ঝড় উঠলো। অনেক তদবির-তদারক করেও কিছু হলো না, জাহাজ ডুবুডুবু। সব মাঝিমাল্লা হাঁটু গেড়ে মোনাজাত (প্রার্থনা) করতে বসলো।

মোল্লা নির্বিকার।

মাল্লারা চোখ খুলে ত্মাখে, মোল্লা চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

'একি ! আপনি এখনো মোনাজাত করেন নি !'

'আমি তো যাত্রী। যাত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব জাহাজ কম্পানির, আমার নয়।'

চব্বিশ

তুই মাতাল মাঝরাত্তিরে মোল্লার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করচে।

নসিরুদ্দীনের ঘুম ভেঙে গেলো। তাঁর একমাত্র সম্বল কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে বাইরে এলেন।

'এত রাত্তিরে ঝামেলা না করে কাল সকালে করলে হতো না ?'

মোল্লা এ কথা বলা মাত্তর এক মাতাল তাঁর কম্বলটি কেড়ে নিলো। তারপর তুজনেই ছুটে পালালো।

'লোকগুলো কী নিয়ে ঝগড়া করছিল ?', জিগেস করলেন মোল্লার বউ।

'বোধহয় আমার কম্বলটা নিয়ে। ওটা পাওয়া মাত্তর দেখি ঝামেলা মিটে গেলো।'

পঁচিশ

তৈমুর লঙ একবার নসিরুদ্দীনকে বললেন :
'মোল্লা, দুনিয়ার সব রাজাই ভগবানের নামওলা কোনো না কোনো খেতাব নেয় ভগবানদত্ত, ভগবানগৃহীত, এই রকম আর কি। তা আমি সে রকম একটা খেতাব নিলে কেমন হয় ?'
'ভগবান রক্ষা করুন !', বললেন নসিরুদ্দীন।

ছাব্বিশ

বৃটিশ মিউজিঅম-এ একদল লোককে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দ্যাখাচ্চেন এক গাইড।
'এই থালাটা পাঁচ হাজার বছরের পুরনো।'
নসিরুদ্দীন ঘরের এক কোণ থেকে শুধরে দিলেন :
'ভুল বললেন। পাঁচ হাজার তিন।'
সবাই বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে মোল্লার দিকে তাকালো। গাইডটি আদৌ খুশি হলেন না।
অন্য একটা ঘরে ঢুকে গাইড বললেন :
'এই বাটিটা আড়াই হাজার বছরের পুরনো।'
'দু হাজার পাঁচ শ তিন।' সুর করে বললেন নসিরুদ্দীন।
গাইডটি খুব চটে গেলেন।
'দেখুন মশাই, এর'ম পাকা হিসেব আপনি দিচ্ছেন কী করে ? প্রাচ্যের লোক বলে কি আপনি সবজান্তা ?'
'সোজা ব্যাপার', মোল্লা বললেন, 'তিন বছর আগেও আমি এখানে এসছিলুম। তখনো আপনি বলেছিলেন, এটা আড়াই হাজার বছরের পুরনো।'

সাতাশ

পঞ্চমীর রাতে, বাগানে সাদা মতন কী একটা দেখে, মোল্লা তাঁর বউকে বললেন তীরধনুক নিয়ে আসতে। তাক করে তীর ছুঁড়েই, মোল্লা গেলেন জিনিসটা কী দেখতে। যখন ফিরে এলেন তখন প্রায় মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা।

বউ খুব ভয় পেয়ে জিগেস করলেন :

'কী হয়েছে ?'

'ইয়ে আল্লা ! খুব বেঁচে গেচি। জামাটা বাইরে শুকুর দেওয়া ছিল। ওটার ভেতর যদি আমি থাকতুম, কী হতো ! তীরটা একেবারে বুকে গিয়ে বিঁধেচে !'

আঠাশ

মোল্লা একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। একজন ঠাট্টা করে জিগেস করলো :

'আপনি দিনে ক-বার দাড়ি কামান ?'

'তা কুড়ি-বাইশবার হবে।'

'সে কি মশাই ?'

'হ্যাঁ। আমি নাপিত।'

উনত্রিশ

নসিরুদ্দীন তখন গাঁয়ের দিকে একটা খাবারের দোকান নিয়েছেন।

হঠাৎ বাদশা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে হাজির।

'সবাইকে ডিমভাজা দাও', হাঁক ছাড়লেন বাদশা।

খেয়ে দেয়ে, মুখ মুছতে মুছতে বাদশা বললেন :

'কত হলো হে ?'

হিসেব করে মোল্লা বললেন :

তেরোটা ডিম ভাজা : এক হাজার মোহর।'

বাদশা ভুরু কোঁচকালেন :

'ডিম তো এখানে খুব আক্রা দেখছি। মুরগীরা কি হরতাল করেছে ?'

'আক্রা তো ডিমের না, বাদশা—রাজারাজড়ার পায়ের ধুলোর।'

তিরিশ

মোল্লা স্বপ্ন দেখছেন।

এক দাতাকর্ণ তাঁর হাতে এক-দুই-তিন করে গুনে গুনে মোহর দিচ্ছেন।

ন-এর পরেই মোহর দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলো।

মোল্লা চেঁচিয়ে উঠলেন :

'আর একটা দাও। দশের কমে নোবো না।'

এমন চ্যাঁচালেন যে নিজেরই ঘুম ভেঙে গেলো। তাকিয়ে দ্যাখেন কোথায় কী !

মোহর তো দূরস্থান, হাতে একটা আধলাও নেই।

আবার শুয়ে পড়ে, চোখ বুঁজে মোল্লা বললেন :

'ঠিক আছে, ন-টাই দাও বাবা।'

একতিরিশ

নসিরুদ্দীন তখন হাকিমি করেন।

মাঝরাতে ফোন এলো।

'এক্ষুনি আসুন, প্রচণ্ড জ্বর।'

'কত ?'

'তা এক শ পঞ্চাশ-ষাট ডিগ্রি হবে।'

'তা'লে আর আমি কী করব ? দমকলে খবর দাও।'

বত্রিশ

'মোল্লা, তোমার পাশের বাড়িতে আজ মাংস রান্না হচ্ছে।'
বিরক্ত হয়ে মোল্লা বললেন :
'তাতে আমার কী?'
'আরে, তোমাকেও তো ভাগ দেবে!'
আরো বিরক্ত হয়ে মোল্লা বললেন :
'তাতে তোমার কী?'

তেত্রিশ

প্রত্যেক শুক্রবার সকালে বাজারে এসে মোল্লা একটা করে গাধা বেচতেন। গাধাগুলো দিব্যি, দামও কম।
এক বড়োলোক গাধাওলা একদিন মোল্লাকে পাকড়ালো।
'কী করে এত কম দামে গাধা দেন মশাই? আমার চাকরগুলো চাষাদের কাছ থেকে বিনি পয়সায় খড় বিচুলি আদায় করে। গাধাগুলো তদারকির জন্যে যাদের রেখেছি তাদের মাইনে দিতে হয় না। তবু তো আমি অত কমে দিতে পারি না।'
'এ তো সহজ ব্যাপার। তুমি শুধু গতর আর খাবার চুরি করো, আমি গাধা চুরি করি।'

চৌত্রিশ

দেশ থেকে এক কুটুম এসছিলেন, সঙ্গে একটা হাঁস নিয়ে। খুশি হয়ে নসিরুদ্দীন হাঁসটা কেটে-কুটে রেঁধে, দুজনে সমান ভাগ করে খেলেন। তারপরেই একটি লোক এসে হাজির। যে কুটুম হাঁস দিয়েছিল এ নাকি তার বন্ধু। নসিরুদ্দীন তাকেও ভালো করে খাওয়ালেন। ক-দিন পর পরই এ জিনিস ঘটতে থাকলো। যত্ত সব দূর দেশের লোক এসে নসিরুদ্দীনের বাড়িটাকে নিখরচায় ভুরিভোজের জায়গা করে তুললো। তারা সবাই সেই হাঁসওলা আত্মীয়ের দূর সম্পর্কের বন্ধু।

নসিরুদ্দীন জেরবার হয়ে গেলেন।

আবার একটা লোক এসে হাজির।

'আপনাকে যে হাঁস দিয়েছিল, আমি তার বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুর বন্ধু।'

'আসুন আসুন' বলে মোল্লা তাকে খুব খাতির করে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন।

খাওয়ার সময় প্রথমেই এলো হাঁসের সুরুয়া।

এক চামচ মুখে তুলেই লোকটা থু-থু করে ফেলে দিলো। সুরুয়া কোথায়? সেরেফ গরম জল।
‘এটা কী ধরনের সুরুয়া হলো?’, চোখ পাকিয়ে জিগেস করলো সে।
‘ওটা’, মোল্লা বললেন, ‘হাঁসের সুরুয়াব সুরুয়ার সুরুয়ার সুরুয়া।’

পঁয়তিরিশ

মোল্লা দাড়ি কামাতে গ্যাচেন।
নাপিতটা আস্ত ডাকাত। এক একবার ক্ষুর চালায়, রক্ত বেরোয়, আর সেখানে এক টুকরো তুলো গুঁজে দেয়। যতক্ষণ-না মোল্লার একটা গাল তুলোয় তুলো হয়ে গেলো ততক্ষণ গাল চাঁচা চললো।
ক্ষুরটা শাণিয়ে নিয়ে নাপিতটি যখন অন্য গালে চালাতে যাবে, হঠাৎ আয়নার দিকে তাকিয়ে মোল্লা আঁতকে উঠলেন।
‘ঠিক আচে ভাই, আর না। আমি এক দিকে তুলো অন্য দিকে বার্লির চাষ করবো ঠিক করেচি।’

ছত্তিরিশ

সরাইখানায় বসে মোল্লা বললেন:
‘অন্ধকারে আমি পষ্ট দেখতে পাই।’
‘তাই যদি হবে তো লণ্ঠন নিয়ে রাস্তায় বেরোও কেন?’
‘আর কেউ যাতে ধাক্কা না মারে।’

সাইতির

মোল্লা এক বড়োলোকের বাড়ি গ্যাচেন।

'আমি—আমায় কিছু টাকা দেবেন?'

'কেন?'

'আমি একটা....হাতি কিনতে চাই।'

'তোমার যদি টাকাই না থাকে, হাতি পুষবে কী দিয়ে?'

'আমি টাকার জন্যে এসচি, উপদেশ শুনতে আসি নি।'

আটতিরিশ

নসিরুদ্দীন ব্যাংকে গ্যাচেন চেক ভাঙাতে।

'প্রমাণ করতে পারবেন আপনিই নসিরুদ্দীন?', করণিক বললেন।

থলি থেকে একটা আয়না বার করে নসিরুদ্দীন চট করে নিজেকে একবার দেখে নিলেন।

'হ্যাঁ। ঠিক আচে। এটা আমিই।'

উনচল্লিশ

নসিরুদ্দীন বাসে উঠেচেন।

কণ্ডাক্টর খানিক বাদে এসে বললেন, 'ভাড়া ?'

নসিরুদ্দীন তাড়াতাড়ি নাববার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন

কণ্ডাক্টর কঁ্যাক করে চেপে ধরলেন।

'ভাড়া না দিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে ?'

নসিরুদ্দীন গম্ভীরভাবে বললেন ঃ

'আপনি আমায় বাসে উঠতে দেখেচেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি আমায় চেনেন ?'

'না।'

'তাহলে কী করে জানলেন, আমিই নেবে যাচ্চি ?'

চল্লিশ

এক সুফি একবার মোল্লাকে বললেন ঃ

'আমি এতই নির্বিকার যে নিজের কথা ভাবি না। শুধু অন্যের কথা ভাবি।'

নসিরুদ্দীন বললেন ঃ

'আমি এতই নিরপেক্ষ যে নিজেকেও পর বলে ভাবতে পারি। তাই নিজের কথা ভাবতে কোনো অসুবিধে হয় না।'

একচল্লিশ

'আমায় যদি এক্ষুনি কেউ খুশি করতে না পারে, দরবারের সব ক-টার গর্দান নেবো।'

হুংকার ছাড়লেন বাদশা।

মোল্লা এগিয়ে এলেন।

'হুজুর, আমি....আমি একটা গাধাকে লেখাপড়া শিখিয়ে পণ্ডিত করে দোবো।'

'হ্যাঁ, তাই করো, নইলে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবো।'

'তাই করবো হুজুর—তবে বছর দশেক সময় লাগবে।'

'ঠিক আছে। দশ বছর সময় দিলাম।'

দরবার ভাঙার পর সবাই মোল্লাকে ঘিরে ধরলো।

'মোল্লা, তুমি কি সত্যিসত্যিই একটা গাধাকে লেখাপড়া শেখাতে পারবে?'

'নাহ্।'

'তাহলে?'

ওয়াজির-এ-আলম গোমড়া মুখে বললেন:

'তার মানে দশটি বছর উৎকণ্ঠায় কাটাতে হবে, কবে গর্দানটা যায়। তার চেয়ে এক মুহূর্তে জল্লাদের খাঁড়া ভালো ছিল না?'

'একটা জিনিস ভুলে যাচ্চেন সবাই', মোল্লা বললেন। 'রাজার বয়েস এখন পঁচাত্তর, আমার আশি। দশ বছর পার হওয়ার আগে অনেক কিছুই ঘটবে। রাজা মারা পড়তে পারেন, আমিও বেহেশ্‌ৎ-এ যেতে পারি। আর—কিছুই বলা যায় না—গাধাটা হয়তো লেখাপড়া শিখেও ফেলতে পারে।'

বেয়াল্লিশ

মোল্লা নসিরুদ্দীন পৌঁছলেন লণ্ডনে। বিমান বন্দরের এক কর্তা এসে তাঁকে পাকড়াও করলেন।

'আপনার নাম ?'

'মোল্লা···পিঁ পিঁ পিঁ····নসিরুদ্দীন।'

'কোথেকে আসছেন ?'

'গ র্ র্ র্···তুর্কি।'

'আপনি তোৎলা নাকি ?'

'উ ই ই ই —নাহ্।'

'তাহলে ও ভাবে কথা বলছেন কেন ?'

'পিপ্ পি প্পিপ্ পি····আমি····গ র্ র্ র্ র্····বেতারে ইংরিজি শিখেচি।'

তেতাল্লিশ

লোকজন দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে মোল্লাকে খবর দিলো :

'ও মোল্লা, তোমার শাশুড়ি নদীতে পড়ে গেছে। জলের যা তোড়, একেবারে সমুদ্রে না ভেসে যায়।'

একটুও না ভেবে মোল্লা সোজা নদীতে ঝাঁপ মেরে স্রোতের উল্টোদিকে সাঁতরাতে লাগলেন।

'ওদিকে না, ওদিকে না। স্রোতের দিকে। ভেসে তো এদিকে যাবে।'

'আমার বউএর মা-কে আমি চিনি না! আর সবাই স্রোতের টানে যে মুখো ভাসবে, উনি ঠিক তার উল্টো দিকে যাবেন।'

চুয়াল্লিশ

চেলার সঙ্গে হ্রদের ধার দিয়ে যেতে যেতে মোল্লা জলের ওপর চাঁদ আর আকাশ-ভরা তারার প্রতিচ্ছবি দেখছেন।

'কী সুন্দ—র! শুধু যদি, শুধু যদি....'

'শুধু যদি কী, গুরু?'

'শুধু যদি জলটা না থাকতো!'

পঁয়তাল্লিশ

হাটের মধ্যেখানে মোল্লা ঘোষণা করলেন :

'বন্ধুগণ, হালে আমি আবিষ্কার করেছি সূর্যের চেয়ে চাঁদ অনেক বেশি উপকারী।'

'কেন, মোল্লা?'

'দিনের চেয়ে রাতেই আলোর দরকার।'

ছেচল্লিশ

বাচ্চা বয়েসে নসিরুদ্দীন একবার বাবাকে জিগেস করেছিলেন :

'তোমার চুল সাদা কেন?'

'ছেলেপুলেরা অসম্ভব সব প্রশ্ন করে লোকের চুল সাদা করে দ্যায়।'

'তাই!', নসিরুদ্দীন বললেন, 'তাই তোমার বাবার চুল একেবারে বরফের মতো সাদা!'

সাতচল্লিশ

মোল্লার বউ গ্যাচেন বাপের বাড়ি। বাড়িতে মোল্লা একা।
মাঝরাতে খুটখাট আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে মোল্লা আলমারির ভেতর
সেঁধোলেন।

আলমারি খুলে চোর তাঁকে দেখতে পেলো।
'এখানে কী লুকিয়ে রেখেছ বাবা?'
'লজ্জায় নিজেকেই লুকিয়ে রেখেচি! এ বাড়িতে তোমার
নেওয়ার মতো কিছু নেই বলে।'

আটচল্লিশ

মোল্লার খুব অসুখ — মরো-মরো অবস্থা।
বউ তো প্রায় থান পরে কাঁদতে বসে গ্যাচেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই দুঃখ-দুঃখ মুখ করে বসে আচে।
এক মোল্লাই নির্বিকার। মুখে একগাল হাসি।
'মোল্লা, মরণ ঘনিয়ে আসছে জেনেও আপনি কী করে এমন অকুতোভয়ে হাসতে পারেন? আমরা, যারা বহাল তবিয়তে আছি, তারা তো ভয়ে মরছি কখন আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যান', ভাঙা গলায় বললেন এক চেলা।
'সিধে কথা', মোল্লা বললেন, 'তোমাদের যত দেখচি ততই মনে হচ্চে, লোকগুলোর যা চেহারা হয়েচে তাতে যমদূত এসে তোমাদেরই কাউকে 'আমি' বলে ভুল করবে। মাঝের থেকে বুড়ো নসিরুদ্দীন আরো ক-দিন বেঁচে যাবে।'

ঊনপঞ্চাশ

ধপ্ করে একটা আওয়াজ শুনে মোল্লার বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।
'ঘাবড়ানোর কিছু নেই', মোল্লা শান্ত ভাবে বললেন, 'আমার আলখাল্লাটা মাটিতে পড়ে গেস্‌লো, এই আর কি!'
'সে কি! তাতেই অত আওয়াজ হলো?'
'আমিও তখন ওর মধ্যে ছিলুম কিনা।'

পঞ্চাশ

এক মা তাঁর ছেলেকে নিয়ে মোল্লার কাছে এলেন।

'ছেলেটা মহা ব্যাদড়া হয়েছে মোল্লা। ওকে একটু ভয় ছ্যাখাও তো।'

মোল্লা চোখ পাকিয়ে, ভুরু কুঁচকে, ঘোঁচ মুখ করে তাকালেন, হুড়ুম দাড়াম লাফ মারলেন, তারপর হঠাৎ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

মোল্লার কারবার-সারবার দেখে মহিলাটিও মূর্ছা গেলেন।

জ্ঞান ফিরতে ছ্যাখেন, মোল্লা হেলতে-দুলতে ফিরছেন।

কটমট করে তাকিয়ে মহিলা বললেন :

'আমি বলেছিলাম ছে লে টা কে ভয় ছ্যাখাতে, আমাকে নয়।'

খুব আহত হয়ে মোল্লা বললেন :

'আপনি তো নিজ চোখে দেখলেন, আমি নিজেই কী ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। আপনার আর দোষ কী !'

একান্ন

নসিরুদ্দীন ঠিক করলেন, বাঁশি বাজানো শিখবেন।

এক বাঁশি-বাজিয়ের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন :

'একেবারে আনাড়ি লোককে বাঁশি শেখাতে আপনি কত নেন ?'

'প্রথম মাসের জন্মে পাঁচ টাকা, তার পরের মাস থেকে এক টাকা।'

'চমৎকার ! আমি তা'লে দ্বিতীয় মাস থেকেই শুরু করব।'

বাহার

গাঁয়ের লোক ঠিক করলো, অনেক কাল মোল্লাকে সহ্য করা গ্যাচে, আর নয়। দল বেঁধে সবাই কাজির কাছে হাজির। সব শুনে তিনি মোল্লাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন:
'নসিরুদ্দীন, গ্রামের লোকের ইচ্ছা অনুসারে আমি ঘোষণা করছি, আপনাকে এই গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে।'
'ওরা কি সবাই একমত?' জানতে চাইলেন নসিরুদ্দীন।
'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, হ্যাঁ।'
'তাহলে, হুজুর, আমার আপত্তি আচে। একদিকে ওরা অতজন— আর আমি একা। এ গাঁ যদি ওদের ভালো না লাগে, ওরা চলে যাক, অন্য গাঁয়ে বসত গাড়ুক। আমি একলা মানুষ, নিজের জন্যে একটা কুঁড়েঘর তোলারও সামর্থ্য নেই।'

তিপায়

ইলেকট্রিক-এর লোক কি খুটখাট করচে। মোল্লা এসে হাজির। আঙুল দেখিয়ে বললেন:
'ওটা কী?'
'ফায়ার অ্যালার্ম। বাড়িতে আগুন ধরলে বাঁচাবে।'
'ও আমি আগেও দেখেচি। কোনো কম্মের না।'
'তার মানে?'
'ঘণ্টা ঠিকই বাজে, কিন্তু আগুন জ্বলতেই থাকে।'

চুয়ান্ন

'আমি যখন মরুভূমিতে থাকতুম, এক পাল হিংস্র বেদুইনকে দৌড় করিয়েছিলুম।'

খুব গর্ব করে বললেন মোল্লা।

'কী করে?'

'সহজ কাজ। আমি ছুটলুম, ওরাও আমার পেছন পেছন ছুটলো।'

পঞ্চান্ন

'স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর জন্যে ডাক যোগে যে শিক্ষাটা নিচ্ছ মোল্লা, তাতে কোনো উপকার পেলে?'

'উন্নতি হচ্চে। এখন তবু মাঝে মধ্যে মনে পড়ে, কী যেন একটা ভুলে গেচি।'

ছাপ্পান্ন

অনেক কষ্টে মোল্লা এক টুকরো সাবান জোগাড় করে আনলেন।
বউকে বললেন :
'জামাটা বহুৎ নোংরা হয়েচে, একটু কেচে দিও তো।'
মোল্লার বউ জামাটা জলে ধুয়ে সাবান ঘষতে যাবেন, এমন সময় একটা কাক এসে সাবানের টুকরোটা নিয়ে ভাগলবা।
বউ তো হায়-হায় করে উঠলেন।
তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে মোল্লা ব্যাপারটা বুঝে নিলেন।
তারপর দাড়ি চোমরাতে চোমরাতে বললেন :
'তা তো বটেই। আমার জামাটা বড়ো জোর কালচে, ওরটা তো একদম কুচকুচে। দরকার তো ওরই বেশি। আমার খরচাতে হলেও, সাবানটা যে পেয়েচে, এই যথেষ্ট। কিন্তু ঐটুকু সাবানে কী-ই বা হবে।'

সাতান্ন

এক জুতোচোর মোল্লার পেছন পেছন মসজিদে গিয়ে ঢুকেচে।
ব্যাপারটা আঁচ করে মোল্লা জুতো না খুলেই নামাজ পড়তে বসে গেলেন।
কাজে বাধা পড়ায় চটে গিয়ে চোরটি বললো :
'জুতো পায়ে দিয়ে নামাজ পড়লে নামাজের ফল থাকে না।'
মোল্লা ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন :
'না। কিন্তু জুতো জোড়া থাকে। সেটাও কম না।'

আটান্ন

বিষ্টির পর রাস্তায় জল জমে আচে। সদাশয় লোকজন কয়েকটি ইঁট ফেলে একটা পথও করে রেখেচেন। মোল্লা সবে দু তিনটে ইঁট পার হয়েচেন, উল্টো দিক থেকেও একজন ইঁট পেরোতে শুরু করলো।

মোল্লা চোখ গরম করে বললেন :

'সরে যান, পথ ছাড়ুন। নইলে কাল যা করেছিলুম আজও তাই করব।'

লোকটি ঘাবড়ে গিয়ে জলে নেবে দাঁড়ালো।

আমীরী চালে জলটুকু পার হলেন মোল্লা।

লোকটির হঠাৎ চৈতন্য হলো। হেঁকে বললো :

'ও মশাই, কাল আপনি কী করেছিলেন ?'

ঘাড় না ঘুরিয়েই মোল্লা বললেন :

'আজ আ প নি যা করলেন, কাল আমিও তাই করেছিলুম।'

উনষাট

অনেকক্ষণ ধরে মোল্লা একটা বাছুরকে খোঁয়াড়ে ঢোকানোর চেষ্টা করচেন। বাছুরটা কিছুতেই যাবে না। রেগে গিয়ে মোল্লা একটা গরুকে খুব ধমকাতে শুরু করলেন।

'গরুটাকে অত বকছ কেন মোল্লা ?' একজন জিগেস করলো।

'সব দোষ তো এর। বাচ্চাটাকে আরো ভালো করে মানুষ করা

ষাট

বাদশা একবার একদল লোক পাঠালেন, সারা দেশ ঢুঁড়ে একটা বিনয়ী লোক খুঁজে বার করতে, যাকে কাজি করা যায়।

খবরটা কী করে যেন নসিরুদ্দীনের কানে গেলো।

মোল্লার গাঁয়ে পৌঁছে তারা ছ্যাখে, গায়ে একটা মাছ ধরার জাল জড়িয়ে মোল্লা বসে আচেন।

'আপনি জাল পরে আছেন কেন?' একজন জানতে চাইলো।
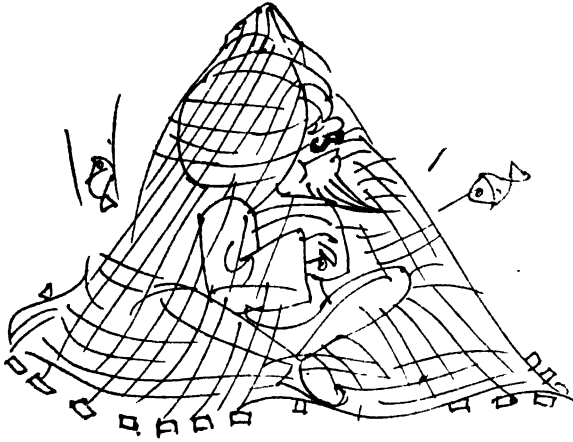
'আমি তো নেহাতই জেলের ছেলে, এখনই না-হয় অনেক ওপরে উঠেচি—সে কথাটা যেন ভুলে না যাই, তাই....'

তাদের সুপারিশে মোল্লা কাজি হলেন।

কিছুদিন বাদে মোল্লাকে দেখতে পেয়ে তাদেরই একজন জিগেস করলো:

'কাজি সাহেব, আপনার সেই জালের কী হলো?'

'এখন আর জাল দিয়ে কী হবে? মাছ তো ধরা পড়েচে।'

একষট্টি

চা-এর দোকানে নসিরুদ্দীনকে পাকড়ে এক বদরসিক বললেন : 'লোকে বলে তোমার নাকি ভীষণ বুদ্ধি। এক শ মোহর বাজি, যদি আমায় বেকুব বানাতে পারো।'

'নিশ্চয়ই পারি। একটু বসুন', বলে মোল্লা হাওয়া।

ঘণ্টা তিনেক হয়ে গ্যাচে, নসিরুদ্দীনের পাত্তা নেই। লোকটিকে স্বীকার করতে হলো, আমি একটা আস্ত বুর্বাক।

মোল্লার বাড়ি গিয়ে চুপিচুপি তিনি এক শ মোহর রেখে এলেন— বাজি হারার খেসারৎ।

মোল্লা ওদিকে খাটে শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্চেন আর ভাবচেন, কী কৌশলে লোকটাকে ঠকানো যায়। হঠাৎ কানে এলো ঝনৎকার। উঠে ছাখেন, এক শ মোহর।

'বাব্বা, বাঁচা গেলো,' মোল্লা বউকে বললেন, 'বাজি হারলে যা দিতে হতো তার ব্যবস্থা হয়ে গ্যাচে। এখন শুধু একটা মতলব ভাঁজলেই হবে। লোকটা নির্ঘাত এখনো আমার জন্যে বসে আচে।'

বাষট্টি

এক বন্ধুর বাড়িতে বসে মোল্লা খুব আড্ডা মারচেন।

গল্প করতে করতে অন্ধকার হয়ে গেলো।

'মোমবাতিটা জ্বালো হে মোল্লা। তোমার বাঁ-হাতেই একটা আছে '

'অন্ধকারে ডান-বাঁ বুঝব কী করে?' কাতর হয়ে বললেন মোল্লা।

তেষট্টি

মোল্লা গ্যাচেন এক বিরাট মসজিদে মোনাজাত করতে। অনেক দিন মোনাজাত করলেন, ফল কিছু পেলেন না।

এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন :

'শেখ আহান-এর তাকিয়ায় গিয়ে মোনাজাত করলে হতো না ? ওটা খুবই ছোটো জায়গা, তবু ক্ষেতি কী !'

মোল্লা গেলেন, মোনাজাত করলেন, ফল পেলেন।

পরের দিন মোল্লা বড়ো মসজিদের দরজায় হাজির। চিৎকার করে বললেন :

'লজ্জা করে না ! ছোট্ট তাকিয়া যা করতে পারে তুমি একটা বুড়োধাড়ি তার কিস্সু পারলে না !'

চৌষট্টি

চা-এর দোকানে বসে একদল সৈন্য খুব হামবড়া করচে।

লোকজন হাঁ করে তাদের গপ্প গিলচে।

'তারপর আমি তো দু-ধারওলা তলোয়ারটা বার করে তাড়া করলাম, পড়ি-কি-মরি করে সব ব্যাটা ছুটে পালালো ', একজন বললো।

সবাই বাহবা দিয়ে উঠলো।

'ভালো কথা মনে পড়েচে', বললেন নসিরুদ্দীন, 'আমি একবার যুদ্ধে এক দুশমনের পা কেটে নিয়েছিলুম। হাঁটু থেকে একেবারে আলাদা করে দিয়েছিলুম।'

'পা কাটলেন কেন ? মাথা কাটলেই তো হতো।'

'অসম্ভব। একজন তো আগেই সেটা কেটে নিয়েছিল।'

পাঁচমিশালি

রাজার কাছে খালি হাতে যেতে নেই। মোল্লা তাই খেতের শালগম নিয়ে চললেন।

পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দ্যাখা। সব শুনে বন্ধু বললেন :

'রাজার কাছে শালগম নিয়ে যাওয়া কি ভালো! তার চেয়ে ডুমুর কি জলপাই নিয়ে যাও।'

বাজার থেকে কিছু ডুমুর কিনে মোল্লা রাজার হাতে দিলেন।

রাজার মেজাজ শরিফ ছিল। খুশি মনে ডুমুরগুলো নিলেন।

উৎসাহ পেয়ে মোল্লা পরের দিন ইয়া বড়া বড়া কমলানেবু নিয়ে হাজির। সেদিন রাজার মেজাজ খারাপ।

সব ক-টা কমলানেবু ছুঁড়ে মারলেন মোল্লাকেই।

মাটি থেকে উঠে মোল্লা বললেন :

'এতক্ষণে বুঝলুম, লোকে কেন রাজার কাছে হালকা জিনিস নিয়ে আসে। কমলানেবুর বদলে শালগম আনলে বাঁচতুম!'

ছেষট্টি

মোল্লার এক পড়শি তাঁর কাপড় শুকোনোর দড়িটা ধার চাইলেন।
'মাপ করো ভাই। ওটা এখন কাজে লাগচে। ময়দা শুকোতে দিয়েচি।'
'দড়িতে টাঙিয়ে ময়দা শুকোচ্ছেন !!'
'দিতে না চাইলে ব্যাপারটা, তুমি যতটা ভাবচ, তার চেয়ে অনেক কম কঠিন।'

সাতষট্টি

সিংদরজায় দাঁড়িয়ে মোল্লা দরোয়ানকে বললেন :
'যাও, বাবুকে বলো, মোল্লা নসিরুদ্দীন এয়েচেন চাঁদা চাইতে।'
দরোয়ানটি ভেতর থেকে ঘুরে এসে জানালেন :
'বাবু বেরিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে।'
'তাহলে তাঁকে একটা কথা বলে দিও। চাঁদা না দিলেও এই পরামর্শটা তিনি নিখরচায় পেতে পারেন। পরের বার বেরোনোর সময় মুণ্ডুটা যেন জানলায় রেখে না যান। যা চোরের উৎপাত।'

আটষট্টি

'তোমার বয়েস কত হলো, মোল্লা ?'
'চল্লিশ।'
'সে কি ! দুবছর আগে যখন শেষ জিগেস করেছিলুম, তখনো তো তা-ই বলেছিলে।'
'হ্যাঁ ভাই, ভদ্দরলোকের এক কথা।'

উপান্তর

একবার একটা চোর মোল্লার বাড়ির যাবতীয় জিনিস—খাট-বিছানা জামা-কাপড় বই-পত্তর সরাতে ব্যস্ত।

রাস্তা থেকে মোল্লা সব দেখলেন। কিচ্ছু বললেন না।

মালপত্তর ঠেলাগাড়িতে তুলে চোর যখন নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিলো, মোল্লাও তার পেছন পেছন চললেন।
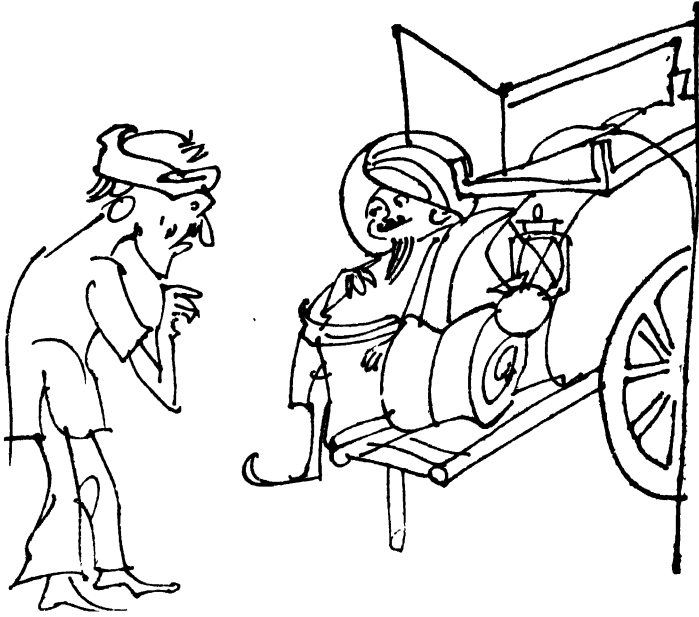
চোরটি এসে নিজের ঘরের দরজা খোলা মাত্তর লাফ দিয়ে মোল্লা ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

মোল্লাকে দেখে খুব অবাক হয়ে চোর বললো:

'তুমি···আপনি এখানে?'

নির্বিকার মুখে মোল্লা বললেন:

'আমরা তো বাড়ি বদল করচি, তাই না?'

সত্তর

চার ইঞ্জিনওলা উড়োজাহাজে কী একটা গণ্ডগোল হয়েচে। ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন :

'আমাদের একটা ইঞ্জিন বিগড়েছে। তবে ভয়ের কিছু নেই। পৌঁছতে মাত্র মিনিট পাঁচেক দেরি হবে।'

যাত্রীদের কেউ কেউ একটু ঘাবড়ে গেলেন। অকুতোভয় মোল্লা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন :

'বন্ধুগণ, পাঁচ মিনিটে কী আর এসে যায়?'

সবাই শান্ত হয়ে বসলো।

কিছুক্ষণ বাদেই আবার ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেলো।

'আরেকটা ইঞ্জিন গড়বড় করছে। দুটো ইঞ্জিনেও চালিয়ে নেয়া যাবে, তবে পৌঁছতে আধ ঘণ্টাটাক দেরি হবে।'

কিছু কিছু যাত্রী বেশ উসখুস করচেন দেখে মোল্লা আবার বললেন :

'বন্ধুগণ, আধঘণ্টা কোনো ব্যাপারই নয়। গাধার পিঠে চড়ে অ্যাদ্দুর আসতে কতটা সময় লাগতো ভাবুন তো।'

যাত্রীরা এই সহজ সত্যটা মেনে নিলেন।

আবার খানিক বাদে ঘোষণা শোনা গেলো :

'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, তৃতীয় ইঞ্জিনটাও বেগড়বাঁই করছে। পৌঁছতে আরো এক ঘণ্টা দেরি হবে।'

মোল্লা বিরক্ত হয়ে বললেন :

'দেখো বাবা, শেষ ইঞ্জিনটার যেন বারোটা না বাজে। তাহলে তো আকাশেই সারা রাত কাটাতে হবে!'

একান্তর

মোল্লা তো কাজি হয়েছেন।

জীবনের প্রথম মামলায় ফরিয়াদীর বক্তব্য শুনে বেসামাল হয়ে তিনি বলে উঠলেন :

'ঠিক বলেচেন! আপনার কথাই ঠিক!'

আদালতের কেরাণী চুপি চুপি বললেন :

'হুজুর, এ তো গেলো ফরিয়াদীর কথা। আসামীর কথাটাও শুনুন।'

আসামী পক্ষের উকিলও অ্যায়সা দারুণ বক্তৃতা করলেন যে মোল্লা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন :

'ঠিক বলেচেন! আপনার কথাই ঠিক!'

কেরাণীটি আবার ফিস ফিস করে বললেন :

'হুজুর, দুজনেই তো একসঙ্গে ঠিক হতে পারে না।'

'ঠিক বলেচেন! আপনার কথাই ঠিক!', জোর ঘাড় নেড়ে বললেন মোল্লা।

বাহাত্তর

মুদির দোকানে দাঁড়িয়ে মোল্লা তাঁর পড়শিদের থলে থেকে ময়দা বার করে নিজের থলেয় ভরছিলেন। হাতে-নাতে ধরা পড়ে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো।

'আমি বোকা হাঁদা মানুষ, পরের ময়দার সঙ্গে নিজের ময়দার তফাৎ বুঝিনে।'

'তাহলে নিজের থলির ময়দা অন্যের থলিতে ঢাললে না কেন?'

'বাহ্! নিজের ময়দার সঙ্গে পরের ময়দার তফাৎ বুঝব না—অতটা গিধ্‌ধড় আমি নই।'

তিয়াত্তর

মোল্লার এক পড়শির বাড়িতে ভোজ। তিনি এলেন একটা গামলা ধার চাইতে। ফেরৎ দেওয়ার সময় সঙ্গে একটা ছোট্ট বাটিও দিলেন।
'এটা কেন?' জিগেস করলেন মোল্লা।
একগাল হেসে পড়শিটি বললেন:
'আপনার সম্পত্তি আমার হেফাজতে থাকার সময় যে বাচ্চা পেড়েছে, আইনত সে তো আপনারই পাওনা।'
দুজনেই হে-হে করে খুব হাসলেন।
কিছুদিন বাদে নসিরুদ্দীন সেই পড়শির কাছ থেকে এক গাদা বাসনকোসন ধার নিয়ে এলেন। কাজকম্ম চুকে গ্যাচে, ফেরত আর দ্যান না।
পড়শিটি তাগাদা দিতে এলেন।
'কী করব বলুন। ওগুলো সব মরে গ্যাচে। আমরা তো আগেই ঠিক করে নিয়েচি, বাসনকোসনেরও প্রাণ আচে।'

মোল্লা গ্যাচেন মনোরোগবিশারদের কাছে।
কোচে শুয়ে তিনি বললেন:
'আমার সমস্যা হলো আমি কিছুই মনে রাখতে পারি না।'
'কবে থেকে এটা শুরু হয়েছে?'
'কবে থেকে কোন্‌টা শুরু হয়েচে?' শূন্য দৃষ্টিতে বললেন নসিরুদ্দীন।

পঁচাত্তর

একটা গরু একবার বেড়া ভেঙে মোল্লার ক্ষেতে ঢুকে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে গেলো। মোল্লা পেছন-পেছন গিয়ে গরুটাকে খুব কষে চাবকালেন।

'তোমার সাহস তো কম নয়! আমার গরুকে চাবকাচ্ছ!'

গরুর মালিক এসে হুংকার ছাড়লো।

'তোমার তাতে কী?' মোল্লাও মেজাজ দেখিয়ে বললেন, 'ও জানে আমি কেন চাবকাচ্চি। আমাদের ব্যাপারে তুমি বাইরের লোক নাক গলাচ্চ কেন?'

ছিয়াত্তর

অন্ধকার গলিতে এক পকেটমার মোল্লার টাকার থলিটা হাতাতে চেষ্টা করলো। মোল্লা সাবধানে ছিলেন। খপ করে তার হাত চেপে ধরে অ্যায়সা প্যাঁচ কষলেন যে লোকটা দড়াম করে পড়ে গেলো। এক দয়ালু বুড়ি সেই সময় গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। মোল্লাকে ধমকে তিনি বললেন :

'অ্যাই হতচ্ছাড়া, দুব্‌লাটাকে ছেড়ে দে বলছি। ওকে উঠতে দে।'

মোল্লা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন :

'মা ঠাকরুণ, লোকটাকে ফেলতে যে কসরৎ করতে হয়েচে সেটা আপনি একদম দেখচেন না।'

সাতাত্তর

মোল্লা তখন গাঁয়ের কাজি। একটা লোক খুব হন্তদন্ত হয়ে এসে বললো :

'রাস্তায় একদল লোক আমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছে! জুতো জামা তলোয়ার সব নিয়ে নিয়েছে গো! লোকগুলো নির্ঘাত এই গাঁয়ের! আপনি একটা বিহিত ব্যবস্থা করুন!'

মোল্লা গম্ভীর হয়ে বললেন :

'সব নিয়েচে মানে? এই তো আপনার গায়ে গেঞ্জি রয়েচে।'

'না, এটাই শুধু নেয় নি।'

'তাহলে ওরা এ গাঁয়ের নয়। এখানকার লোক হলে এত কাঁচা কাজ করতো না।'

আটাত্তর

গাজর খেয়ে বাদশার খুব ভালো লাগলো। বাবুর্চির ওপর হুকুম হলো, রোজ পাতে গাজর দিতে।

'গাজর তুনিয়ার সেরা খাবার, কী বলো, নসিরুদ্দীন?' বাদশা বললেন।

'সবার সেরা, কোনো সন্দেহ নেই', বললেন মোল্লা।

দিন কয়েক বাদে, তুবেলা গাজর খেয়ে, বাদশার অরুচি ধরে গেলো।

'ওগুলো সরিয়ে নাও। গাজর দেখলেই আমার ঘেন্না করে', চোখে হাত চেপে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

'সত্যি, কোন্ সুখে যে লোকে গাজর খায় বুঝিনে। যাচ্ছেতাই খেতে,' মোল্লা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন।

'কিন্তু মোল্লা, তুমি যে এই সেদিন বললে গাজর সবার সেরা?'

'সে তখন বলেছিলুম। আমি তো আর গাজরের চাকর নই যে এখনো তাই বলব।'

উনআশি

নসিরুদ্দীন তো মাংস-র বড়ার দোকান খুলেচেন। দোকানের গায়ে লেখা : আমি আসলে ছাত্র হতে চাই।

বড়াগুলো একেবারে অখাদ্য। পাড়ার লোকে জেরবার হয়ে কিছু চাঁদা তুলে মোল্লার হাতে দিয়ে বললো :

'যাও বাবা, এবার বিদেয় হও। ঐ গন্ধ থেকে আমরা বাঁচি। আর হ্যাঁ, তুমি কী শিখবে?'

'কী করে মাংস-র বড়া রাঁধতে হয়।'

আশি

তাতার আক্রমণের সময়, মোল্লা এক মসজিদে বক্তৃতা করচেন। সবাই জানে, মোল্লা তৈমুর লঙের ঘোর বিরোধী। এমনকি তৈমুরও জানেন। দরবেশ সেজে তৈমুরও ঢুকে পড়েচেন মসজিদে।

বক্তৃতার শেষে মোল্লা অভ্যেসমতো বললেন :

'আল্লা তাতারদের খতম করবেন।'

এক দরবেশ এগিয়ে এসে বললেন :

'আল্লা তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন না।'

'কেন ?' জিগেস করলেন নসিরুদ্দীন।

'তোমাদের পাপের শাস্তি। যে শাস্তি দিতে তাতাররা আসছে, তার জন্যে তারা শাস্তি পেতে যাবে কোন্ দুঃখে ?'

মোল্লা একটু খচমচ করে উঠলেন। দরবেশদের নিয়ে ইয়ার্কি চলে না।

'আপনি কে ?' জিগেস করলেন তিনি।

'আমি একজন দরবেশ, আমার নাম তৈমুর।'

ভিড়ের ভেতর থেকে বেশ কিছু লোক উঠে দাঁড়ালো। হাতে তীর ধনুক। তারা তৈমুরেরই লোক।

এক নজরে ব্যাপারটা দেখে নিয়ে মোল্লা বললেন :

'আপনার নাম কি 'ল্যাংড়া' দিয়ে শেষ ?'

ভয়ে সবার হাত-পা পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে গ্যাচে। এবার তাদের দিকে ফিরে মোল্লা বললেন :

'ভাইসব, এতক্ষণ আমরা সবাই মিলে মোনাজাত করেচি। এবার দাফন (শেষকৃত্য)-এর জন্যে তৈরি হোন।'

একাশি

মোল্লা গ্যাচেন আরেক মোল্লার বাড়ি।

'একটু কিছু খাবেন নাকি ?' সেই মোল্লা জিগেস করলেন।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে মোল্লা কখনো 'না' বলেন না। কিন্তু যখন খাবার এলো, ছ্যাখা গেলো সত্যিই এক গরাসের বেশি আসে নি।

এমন সময় একটি দুস্থ লোক জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন।

বাড়ির মালিক হুংকার ছাড়লেন :

'বেইর‍্যে যাও, নইলে ঘাড় মটকে দেবো।'

নসিরুদ্দীন লোকটিকে বললেন :

'চলে যান ভাই, শিগ্‌গির চলে যান। হলফ করে বলতে পারি, এ লোকটা বাড়িয়ে বলে না।'

বিরাশি

নসিরুদ্দীন বাজার থেকে মাংস কিনে আনলেন। বউকে বললেন রাঁধতে। লোকজন খেতে আসবে।

চাখতে গিয়ে বউ-এর লোভ লেগে গেলো। নিজেই পুরোটা খেয়ে ফেললেন।

মোল্লা বাড়ি ফিরে খেতে চাইলেন।

'বেড়ালটা সব খেয়ে ফেলেছে। পুরো এক সের' বউ কাঁচুমাঁচু হয়ে বললেন।

নসিরুদ্দীন একটা দাঁড়িপাল্লা এনে বেড়ালটাকে তার ওপর চাপালেন। ওজন হলো এক সের।

'এটা যদি বেড়াল হয়', নসিরুদ্দীন গম্ভীর মুখে বললেন, 'মাংসটা গেলো কোথায় ? আর এটা যদি মাংস হয় — বেড়ালটা কই ?'

তিরাশি

দরবারে গ্যাচেন মোল্লা। মাথায় বেশ রকমদার এক পাগড়ি।
বাদশা তো পাগড়ি দেখে খুব খুশি।
'পাগড়িটা কত পড়লো হে মোল্লা?'
'এক হাজার মোহর।'
এক উজীর তাড়াতাড়ি রাজার কানে কানে বললেন:
'ঐ পাগড়ির জন্যে অত খরচ করা ডাহা বোকামি।'
তাঁর কথায় ঘাড় নেড়ে, বাদশা মোল্লাকে বললেন:

'পাগড়ির দাম হাজার মোহর—এ তো জীবনে শুনি নি। কে অত দাম দিয়ে কিনবে?'
'শাহানশা কিনবেন বলেই তো আমি এটা নিলুম। এ দুনিয়ায় আপনি ছাড়া আর কে এ জিনিসের কদর বুঝবে?'

নিজের প্রশংসায় খুশি হয়ে বাদশা মোল্লাকে দু হাজার মোহর ইনাম দিলেন।
আড়ালে সেই উজীরকে ডেকে মোল্লা বললেন :
'আপনি হয় তো পাগড়ির দাম-টাম ভালোই জানেন। তবে রাজা-রাজড়ার দুর্বলতাটা আমারও ভালো জানা আছে।'

চুরাশি

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মোল্লা কী একটা দেখে ভয় পেলেন। ব্যস, সোজা ঝাঁপ মারলেন নালায়। আর তখনি কেমন মনে হলো : আমি 'বোধয়' ভয়েই মরে গেচি।
খানিক বাদে বেশ শীতও করচে, খিদেও পেয়েচে। হঠাৎ মনে হলো, বউ তো দেরি দেখে ভাববে। বাড়ি গিয়ে নিজের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে মোল্লা আবার নালায় ফিরে গেলেন।
বউ তো ফোঁপাতে ফোঁপাতে পাড়াপড়শির বাড়ি গেলেন সান্ত্বনা পেতে।
'আমার কত্তা মারা পড়েছে গো, একটা নালায় পড়ে আছে—ও হো হো।'
সবাই ধরে পড়লো :
'তুমি সে কথা জানলে কী করে?'
'বেচারা গো! জানাবার মতো কেউ তো ছিল না! তাই নিজেই এসে বল্লে গেলো।'

পঁচাশি

গাধার পিঠে চড়ে মোল্লা প্রায়ই পারস্য থেকে গ্রীসে যাতায়াত করতেন। যাওয়ার সময় সঙ্গে থাকতো দু আঁটি খড়, ফেরার সময় কিছু না। প্রত্যেকবারই সীমান্তের রক্ষীরা আগাপাস্তলা খানাতল্লাশ করতো। কিন্তু বেআইনি কিছুই পাওয়া যেতো না।

'নসিরুদ্দীন, সঙ্গে করে কী নিয়ে যাচ্ছ?'

'আমি একজন স্মাগলার—চোরাচালান করি।'

বছর কয়েকের মধ্যে নসিরুদ্দীনের হাল ফিরে গেলো। দুধে-ঘিয়ে বেশ শাঁসালো চেহারা হলো। নসিরুদ্দীন চললেন মিশরের দিকে। সেখানে এক গ্রীক সীমান্তরক্ষীর সঙ্গে দ্যাখা।

'মোল্লা, তুমি তো এখন গ্রীস-পারস্য দুএরই আওতার বাইরে। রইস আদমির মতো দিন কাটাচ্ছ। সত্যি করে বলো তো, তুমি কী মাল চালান করতে? জীবনে কেউ তোমায় ধরতে পারলে না!'

'গাধা চালান দিতুম রে গাধা।'

ছিয়াশি

মোল্লা দাঁড়িয়ে আচেন ফুটবল মাঠে টিকিটের লাইনে। ভিড় একেবারে উপচে পড়চে

ব্ল্যাকে টিকিট কিনতে কিনতে একটা লোক বললো:

'এত ভিড়! পাগলা হয়ে যাব!'

'আপনার গত হপ্তায় আসা উচিত ছিল', বললেন মোল্লা।

'সে কি! এর চেয়েও খারাপ অবস্থা ছিল?'

'না। ভালো। একটা পাগড়িও দ্যাখা যেতো না। সেদিন খেলাই ছিল না।'

সাতাশি

গাধার পিঠে চেপে, বোকার দেশ দিয়ে যাচ্চেন নসিরুদ্দীন। পথে ঐ রাজ্যের দুই মহাত্মার সঙ্গে ছাখা।

'আস্সালামো আলায়কুম', বললেন নসিরুদ্দীন।

'লোকটা কাকে বললো রে, তোকে না আমাকে?' এক বোকা জিগেস করলো অন্য বোকাকে।

'ধ্যার্ ব্যাটা। আমায় বলেছে। তোকে বলতে যাবে কোন্ দুঃখে?'

ব্যস। নারদ-নারদ করে দুজনের লেগে গেলো। মার খেয়ে দুজনেরই বুদ্ধি খুললো, যে বলেচে তাকে জিগেস করলেই তো হয়।

দুজনেই ছুটলো মোল্লাকে ধরতে।

'কাকে আপনি আস্সালামো আলায়কুম বলেছিলেন?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিগেস করলো তারা।

'তোমাদের মধ্যে যে বেশি বোকা তাকে।'

'সে তো আমিই!' প্রথম বোকা বললো।

'হ্যাট! আমি!'

আবার দুজনের মারপিট লেগে গেলো।

অষ্টআশি

নসিরুদ্দীনের গাড়ি থামিয়ে পুলিশ বললো:

'আপনাকে থানায় যেতে হবে। লাল আলো জ্বলছে আর আপনি মেজাজে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন!'

মোল্লা বললেন:

'ঠিক আচে। আমিও জজকে বলব, ধর্মাবতার, সবুজ আলো সত্ত্বেও কতবার আমি দাঁড়িয়ে থেকেচি—সেটাও হিসেবে ধরবেন।'

ঊননব্বই

মোল্লা একবার হিন্দুকুশ পার হয়ে হিন্দুস্তানে এয়েচেন, তেষ্টার চোটে জিভ বেরিয়ে গ্যাচে। হিন্দুস্তানের রসালো ফল দিয়েই তেষ্টা মেটাবেন ঠিক করলেন।

বাজারে একটা লোক এক ধামা লাল টুকটুকে ফল নিয়ে বসে ছিল। মোল্লা ট্যাঁক থেকে দুটি তাঁবার পয়সা বার করে দিলেন। লোকটা কোনো কথা না বলে ধামাসুদ্ধু ফল দিয়ে চলে গেলো।

মোল্লা বেশ আয়েস করে এক মুঠো মুখে পুরলেন। কিছুক্ষণ

বাদেই চোখ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করলো, গলার জ্বলুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

তবু মোল্লা খেয়েই চলেচেন।

ঘণ্টা কয়েক বাদে, এক কাবলিওলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। মোল্লা

তাকে ডেকে বললেন :

'মেরে বেরাদর, এই কাফের ফলগুলো খোদ শয়তানের তৈরি।'

কাবলিওলা ধমকে বললেন :

'আরে বুর্বাক, হিন্দুস্তানের লঙ্কার নাম শোনো নি? খাওয়া বন্ধ করো, না হলে সূর্যি ডোবার আগেই পটল তুলতে হবে।'

'ধামা খালি না করে আমি উঠতে পারব না', মোল্লার সাফ জবাব।

'আরে পাগল, এসব ফল তরকারিতে দেয়। ফেলে দাও, ফেলে দাও।'

ভাঙা গলায় মোল্লা বললেন :

'আমি তো আর ফল খাচ্ছি না, পয়সা খাচ্ছি।'

নব্বই

'বাবা নসিরুদ্দীন, ভোর-ভোর ঘুম থেকে উঠতে শেখো।'

মোল্লার বাবা ছেলেকে সদুপদেশ দিচ্ছিলেন।

'কেন বাবা?'

'এটা খুব ভালো অভ্যেস। আরে, একদিন সকালবেলা, ঘুম থেকে উঠে, বেড়াতে বেরিয়ে, রাস্তায় এক বস্তা সোনা পেয়েছিলুম!'

'কী করে জানলে সেটা রাত্তির থেকেই পড়ে ছিল না?'

'সেটা কথা নয়। যাই হোক, রাত্তিরে বস্তাটা ছিল না, আমি নজর করে দেখেছিলুম।'

'তাহলে সকালে উঠলে সকলেরই ভালো হয় না। যার বস্তা, সে নির্ঘাত তোমার চেয়েও আগে বেরিয়েছিল।'

একানব্বই

গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে মোল্লা যাচ্ছেন। পাড়ার বাচ্চারা হঠাৎ ঢিল মারতে শুরু করলো। মোল্লা নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বললেন :
'বাবারা! ঢিল মেরো না, একটা চমৎ—কার কথা বলব, শোনো।'
'ঠিক আছে। কিন্তু জ্ঞান দিও না।'
'আমীরের বাড়িতে আজ বিরাট খানাপিনা। যে যাবে তাকেই খাওয়াবে।'
বাচ্চারা হুড়মুড় করে আমীরের বাড়ির দিকে ছুটলো।
মোল্লা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। খানিক বাদে, জোব্বাটা ঠিক করে নিয়ে, তিনিও তাদের পেছন পেছন ছুটলেন।
রাস্তার লোকে অবাক হয়ে বললো :
'ও মোল্লা, তুমি আবার ওদিকে চললে কেন?'
হাঁপাতে হাঁপাতে মোল্লা বললেন :
'একবার গিয়ে দেখে আসাই ভালো। যা বললুম সেটা তো সত্যিও হতে পারে।'

বিরানব্বই

'মোল্লা, একটা চিঠি লিখে দেবে?'
'আমি এখন পারব না ভাই। আমার পা মচকে গ্যাচে।'
'তার সঙ্গে চিঠি লেখার কী সম্পর্ক?'
আমার দেবাক্ষর তো কেউ পড়তে পারবে না। আমাকেই গিয়ে পড়ে দিয়ে আসতে হবে। তাই....'

জ্ঞানবই

মোল্লা গ্যাচেন বিয়ে বাড়িতে। আগের যে বিয়ে বাড়িতে গেস্‌লেন সেখান থেকে জুতো জোড়া হাওয়া হয়ে গেস্‌লো। এবার তাই দোর-গোড়ায় জুতো না ছেড়ে, জোব্বার ভেতরের পকেটে রেখে মোল্লা খেতে বসলেন।

'আপনার পকেটে ওটা কী বই?' একজন জিগেস করলেন।

'লোকটা হয়তো আমার জুতো চুরি করতে চায়!' মোল্লা প্রথমেই

ভাবলেন, 'তা ছাড়া লোকে আমায় জ্ঞানীগুণী বলে জানে, সেই নামটাও তো বজায় রাখতে হবে।'

যাই হোক, মুখে বললেন:

'ঐ উঁচু হয়ে থাকা জিনিসটার বিষয় হলো 'সাবধানতা'।'

'আচ্ছা! কোন্ দোকানে বইটা পাওয়া যায়?'

'আমি অবিশ্যি এটা মুচির কাছ থেকে পেয়েচি।'

চুরানব্বই

এক চেলাকে নিয়ে মোল্লা গ্যাচেন গর্ত থেকে নেকড়ের ছানা ধরতে। মোল্লাই পয়লা ঢুকেচেন। আর হবি তো হ, একটা ভয়ংকর হিংস্র ধাড়ী নেকড়ে তাঁকে তাড়া করলো। দুজনের মধ্যে কী-ঝুটোপুটি। এর মধ্যে চেলা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো :

'ওভাবে লাথি ছুঁড়বেন না, আমি আদ্ধেক মাটি চাপা পড়ে গেছি।'

'আমি যা করচি সেটা যদি বন্ধ করি', হাঁপাতে হাঁপাতে মোল্লা বললেন, 'তবে তোমার বাকি আদ্ধেকটাও চাপা পড়ে যাবে।'

পঁচানব্বই

পাতাল রেল। রেলিং টপকে একটা লোক পড়ে গ্যাচে। লোকে চিৎকার করে বলচে :

'আপনার হাতটা এগিয়ে দিন।'

লোকটা নড়েও না, চড়েও না।

কনুই মেরে ভিড় সরিয়ে মোল্লা এগিয়ে এলেন।

'দোস্ত, আপনার কী করা হয়?'

'আয়কর বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর', চোখ খুলে লোকটি বললো।

'তাহলে আমার হাতটা নিন।'

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মোল্লার হাত ধরে উঠে এলো।

সবাই হাঁ করে মোল্লার দিকে তাকিয়ে আচে।

'আরে হাঁদার দল, আয়কর বিভাগের লোককে কিছু 'দাও' বলতে নেই।'

এই বলে মোল্লা চলে গেলেন।

ছিয়ানব্বই

নসিরুদ্দীন আর এক বন্ধু দোকানে ঢুকেচেন দুধ খেতে। পয়সার টানাটানি, এক গেলাস দুধ নিয়ে দু জনে ভাগ করে খাবেন।

'তুমিই ভাই প্রথমটা খাও', বন্ধু বললেন। 'আমার কাছে এই একটু চিনি আছে। তাতে দুজনের কুলোবে না। তোমার খাওয়া হয়ে গেলে, চিনি মিশিয়ে, বাকি অদ্ধেকটা আমি খাবো।'

'এক্ষুনি মিশিয়ে দে না ভাই, সত্যি বলচি, আদ্ধেকের বেশি এক ফোঁটাও আমি খাব না।'

বন্ধুটি নাছোড়বান্দা।

'না ভাই, আমার কাছে যট্টুকু চিনি আছে তাতে বড়ো জোর আধ গেলাস দুধ মিষ্টি হতে পারে।'

'ঠিক আচে', বলে নসিরুদ্দীন দোকানের ভেতর থেকে এক মুঠো নুন নিয়ে এলেন।

'ব্যাপারটা সব ঠিকঠাক করে ফেলেচি। তুমি যা বলেছিলে, তা-ই হবে। আমিই প্রথম খাব—তবে নুন মিশিয়ে।'

সাতানব্বই

'মোল্লা, তোমার বয়েস কত?'

'আমার ভাই-এর চেয়ে আমি তিন বছর বড়ো।'

'তোমার ভাই-এর বয়েস কত?'

'সে আমি জানি না। গত বছর ভাই একজনকে বলছিল যে আমি নাকি ওর চেয়ে দু বছরের বড়ো। তারপর তো এক বছর হয়ে গ্যাচে—'

আটানব্বই

এক পণ্ডিত দর্শন নিয়ে বক্তৃতা করবেন। মোল্লাও শুনতে গ্যাচেন। সব শুনে মোল্লা বললেন :

'এই সব ধ্যানধারণাগুলো কি আপনার নিজস্ব ?'

পণ্ডিত বললেন :

'তা কেন ? আমার গুরু বিশ বছর আগে বোগদাদে এসব শিখিয়েছিলেন।'

'বিশ বছর আগে অন্য এক জায়গায় বসে আপনাকে তিনি যা শিখিয়েছিলেন তা কি এখনো এখানে সত্যি হতে পারে ?'

'কী অদ্ভুত কথা ! লোকে এত বোকা-বোকা প্রশ্ন করে ! সত্য কখনো পাল্টায় ?'

কিছুদিন বাদে মোল্লাকে আবার সেই পণ্ডিতের কাছে যেতে হলো— বাগানে মালির কাজ করতে।

'তুমি তো বুড়ো হয়ে গেছ। বাগানের কাজ পারবে ?'

'আমায় দেখতে বুড়ো লাগে। বিশ বছর আগে আমার গায়ে

যা জোর ছিল, এখনো তাই আছে।'
কাজটা মোল্লার কপালেই জুটলো।
একদিন সেই পণ্ডিত মোল্লাকে বললেন একটা চাঁই পাথর বাগানের একোণ থেকে ওকোণে সরিয়ে রাখতে। মোল্লা বহুৎ তকলিফ করলেন, পাথর এক চুলও নড়লো না। পণ্ডিত গম্ভীর হয়ে বললেন :
'তবে যে বলেছিলে বিশ বছর আগে তোমার গায়ে যা জোর ছিল এখনো তাই আছে?'
'তাই তো আছে। সমান জোর। বিশ বছর আগেও ঐ পাথর আমি তুলতে পারতুম নাকি?'

নিরানব্বই

শাহানশা শিকারে বেরোচ্চেন। পথে মোল্লার সঙ্গে ছ্যাখা। শাহানশার মেজাজ একটু ছানা কেটে ছিল। মোল্লার দিকে চোখ পড়তেই হুকুম দিলেন :
'চাবকাও ব্যাটা অপয়াকে—দূর করে দাও চোখের সামনে থেকে।'
ইয়ারবকশীরা তাই করলো।
শিকারটা অবিশ্যি ভালোই হলো।
ফিরে এসে শাহানশা মোল্লাকে ডেকে পাঠালেন।
'ভেরি সরি, মোল্লা। আমি তোমায় অপয়া ভেবেছিলাম। ছ্যাখা যাচ্ছে তা নয়।'
খুব আহত গলায় মোল্লা বললেন :
'আপনি ভেবেছিলেন আমি অপয়া? ব্যাপারটা দেখুন। আমার দিকে চোখ পড়লো, আপনি এক রাশ শিকার পেলেন। আর আপনাকে, দেখে আমি কী পেলুম? চাবুক। কে তাহলে অপয়া?'

একশ

নসিরুদ্দীন রাজধানী থেকে ফিরেচেন।

খবর পেয়ে গাঁয়ের লোক নসিরুদ্দীনের বাড়িতে ভেঙে পড়লো।

মোল্লা শান্তভাবে বললেন :

'আমি বেশি কথা বলতে চাই না। তবে আমার জীবনের সেরা মুহূর্ত যখন খোদ বাদশা আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বললেন। চারধারে বহু লোক তার সাক্ষী আচে।'

এত বড়ো খবর শুনে গাঁয়ের লোক একেবারে মুগ্ধ হয়ে, 'মারহাব্বা' বলে ফিরে গেলো।

একটি লোক সবার শেষে বেরোনোর সময় হঠাৎ নসিরুদ্দীনকে জিগেস করলো :

'বাদশা আপনাকে কী বলেছিলেন?'

'আমি প্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়েছিলুম, বাদশা তখন বেরোচ্ছিলেন। আমায় দেখতে পেয়ে পষ্ট বললেন : এখান থেকে দূর হও!'

লোকটি খুশি হয়ে ফিরে গেলো। বাদশা ঠিক কী বলেছিলেন সেটাও সে জানতে পেরেচে।

একশ এক

নসিরুদ্দীন গ্যাচেন ইন্টারভিউ দিতে।

ম্যানেজার বললেন :

'আমরা চাই এমন লোক যার বেশ উচ্চাশা আছে। তুমি ঠিক কী ধরনের কাজ চাও?'

'ঠিক আচে', নসিরুদ্দীন বললেন, 'আমি আপনার কাজটাই করবো। ম্যানেজারের কাজ।'

'তুমি কি পাগল হয়েছ?'

'তা হতে পারি। কিন্তু সেটা না-হলে কি কাজটা পাব না?'

শতম